আঞ্চলিক নাগরিক সংলাপ: চট্টগ্রাম

জাতীয়নির্বাচন ২০০৭: জবাবদিহিমূলক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সুশীল সমাজের উদ্যোগ

যারা কথা বলেছেন

১. **অধ্যাপক সিকান্দার খান,** (সভাপতি), অর্থনীতিবিদ
২. **মতিউর রহমান,** সম্পাদক, প্রথম আলো
৩. **অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দীন,** সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৪. **ডা. খুরশীদ জামিল,** সাধারণ সম্পাদক, বিএমএ, চট্টগ্রাম জেলা
৫. **বেগম মুশতারী শফি,** নারী নেত্রী এবং আঞ্চলিক আহবায়ক, টিআইবি
৬. **এস এম নূরুল হক,** ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৭. **অ্যাডভোকেট খায়রুল ইসলাম,** সভাপতি, চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতি
৮. **মনোয়ারা বেগম,** কমিশনার, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন
৯. **ড. এমরান হোসেন,** অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১০. **এমদাদুল হক চৌধুরী,** সাংগঠনিক সম্পাদক, পেশাজীবী সংগ্রাম পরিষদ, চট্টগ্রাম
১১. **সুমিমা ইয়াসমিন সুমি,** সহসম্পাদক, দৈনিক আজাদী
১২. **জিয়া হায়দার,** অধ্যাপক (অব.) চারুকলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
১৩. **মাহাবুব আলী,** প্রেসিডেন্ট, শিপার্স কাউন্সিল অব বাংলাদেশ
১৪. **জামাল নজরুল ইসলাম,** ইমেরিটাস অধ্যাপক, গণিত ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য 'নাগরিক কমিটি-২০০৬'
১৫. **মুজিবুর রহমান**
১৬. **রানা দাশগুপ্ত,** আইনজীবী, চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতি
১৭. **আলী আশরাফ,** সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম
১৮. **কমডোর এ জেড নিজাম (অব.),** রিসার্চ সোসাইটি অব বাংলাদেশ
১৯. **রেহানা কবির রাণু,** কমিশনার, চটগ্রাম সিটি করপোরেশন
২০. **জেরিনা হোসেন,** নগর পরিকল্পনাবিদ, অধিকার, চট্টগ্রাম
২১. **আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ,** সভাপতি, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ও সহ-আহ্বায়ক 'নাগরিক কমিটি-২০০৬'
২২. **অ্যাডভোকেট এমদাদুল ইসলাম,** সভাপতি, গণফোরাম
২৩. **কমরেড শাহ আলম,** সম্পাদক, সিপিবি, চট্টগ্রাম জেলা
২৪. **মাজহারুল হক শাহ চৌধুরী,** ভাইস চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি
২৫. **স্বপন সেন,** সহসভাপতি, গণতন্ত্রী পার্টি
২৬. **পংকজ ভট্টাচার্য,** প্রেসিডিয়াম সদস্য, গণফোরাম
২৭. **আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী,** সংসদ সদস্য
২৮. **ড. মুহাম্মদ সিরাজুল হক,** চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
২৯. **নূরুল ইসলাম**
৩০. **নূরজাহান খান,** সভাপতি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, চট্টগ্রাম
৩১. **নীরা,** শিক্ষার্থী, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৩২. **জাহাঙ্গীর আলম,** অর্থ-সম্পাদক, প্রথম আলো বন্ধুসভা, চট্টগ্রাম
৩৩. **বৃজেট ডায়েস,** সংস্কৃতিকর্মী ও শিক্ষিকা
৩৪. **সুলতান মাহমুদ,** সাবেক প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
৩৫. **অ্যাডভোকেট মনতোষ বড়ুয়া,** সাবেক সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি

৩৬.**এরশাদ উল্লাহ্,** ডিরেক্টর, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৩৭.**সঞ্জয় আচার্য,** প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, প্রথম আলো বন্ধুসভা, চট্টগ্রাম
৩৮.**কফিলউদ্দিন,** সাবেক সংসদ সদস্য ও সভাপতি, চট্টগ্রাম নগর গণফোরাম
৩৯.**অধ্যাপক এ কিউ এম সিরাজুল ইসলাম,** সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিএমএ, চট্টগ্রাম
৪০.**মোহাম্মদ ইসহাক,** সভাপতি, বাংলাদেশ সংবাদপত্র এজেন্ট সমিতি
৪১.**হোসাইন কবির,** সভাপতি ও সহযোগী অধ্যাপক, লোকপ্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৪২.**শঙ্কর প্রসাদ দে,** আইনজীবী
৪৩.**সঞ্জীব বড়ুয়া,** বেসরকারি কলেজ শিক্ষক, সংস্কৃতিকর্মী
৪৪.**নূরুল আলম মাসুদ,** প্রধান নির্বাহী, পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন নেটওয়ার্ক, নোয়াখালী
৪৫.**উত্তম চৌধুরী,** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, চট্টগ্রাম
৪৬.**দেলোয়ার মজুমদার,** সদস্য সচিব, তেল-গ্যাস-খনিজসম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি, চট্টগ্রাম
৪৭.**সেলিম নজরুল,** প্রতিবন্ধী সংগঠক
৪৮.**আহসান উল্লাহ চৌধুরী,** রাজনৈতিক কর্মী
৪৯.**আব্দুল আউয়াল,** প্রধান নির্বাহী, এনআরডিএস, নোয়াখালী ও সভাপতি, সুপ্র-জাতীয় কমিটি
৫০.**জয়নুল আবেদীন,** উদ্যোক্তা
৫১.**শামসুল আলম টগর,** উপ-নির্বাহী পরিচালক, চন্দনাইশ সোসাইটি
৫২.**মো. নূরুল আমিন মানিক,** সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয় যুব সংগঠন ফেডারেশন, চট্টগ্রাম
৫৩.**সামসুল হোসাইন,** সংস্কৃতিকর্মী
৫৪.**দুর্জয় দে**
৫৫.**আকিঞ্চন বড়ুয়া,** স্বেচ্ছাসেবক, জানিপপ
৫৬.**শাকিলা,** প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট, জানিপপ
৫৭.**অধ্যাপক গাজী সালেহ উদ্দিন,** চেয়ারম্যান, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৫৮.**নাজিম-উল হক,** নির্বাহী পরিচালক, সোশ্যাল আপলিফটম্যান্ট ফাউন্ডেশন
৫৯.**শাহরিয়ার হাসান,** সাহিত্য সম্পাদক, প্রথম আলো বন্ধুসভা, চট্টগ্রাম
৬০.**শাহনেওয়াজ রিটন,** কবি ও সাংবাদিক
৬১.**জোবায়ের সিকদার,** ছাত্রনেতা
৬২.**অ্যাডভোকেট আবু হানিফ,** সম্পাদক, ওয়ার্কার্স পার্টি, চট্টগ্রাম মহানগর
৬৩.**সাইয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু,** কমিশনার, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন
৬৪.**শেখ ইফতেখার সাইমুল চৌধুরী,** আইনজীবী
৬৫.**মোহাম্মদ শহিদুল আলম,** কমিশনার, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন
৬৬.**শায়ের আমান,** প্রথম আলো বন্ধুসভা, চট্টগ্রাম
৬৭.**নোমান ফারুকী,** প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস, আলিম মাদ্রাসা
৬৮.**নাজমুল হুদা,** পেশাজীবী
৬৯.**আদনান মান্নান,** ছাত্র
৭০.**অ্যাডভোকেট আখতার কবীর চৌধুরী,** সদস্য সচিব, সুজন
৭১.**সৈয়দ মোরশেদ হোসেন,** চেয়ারম্যান, অন্বেষা
৭২.**ওমর কায়সার,** সাংবাদিক
৭৩.**মোঃ রাশেদুল আমিন,** ব্যাংক কর্মকর্তা
৭৪.**এস এম জামাল উদ্দিন,** কর্মকর্তা, ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশ
৭৫.**রতন কুমার রায়,** সাধারণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি

৭৬.**সাবিহা মুসা,** কমিশনার, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন
৭৭.**নূরুন্নাহার বেগম,** শিক্ষক এবং সদস্য, প্রথম আলো বন্ধুসভা, চট্টগ্রাম
৭৮.**রেজাউল করিম,** চেয়ারম্যান, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৭৯.**এম এ লতিফ,** সহসভাপতি, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি
৮০.**এম এ নাসের,** কমিশনার, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন
৮১.**আবুল কালাম আজাদ,** আইনজীবী
৮২.**ভূঁইয়া ইকবাল,** অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
৮৩.**প্রফেসার হান্নানা বেগম**
৮৪.**মো. নাজিম উদ্দিন,** ভিপি, চাকসু
৮৫.**এম সালাউদ্দিন,** সভাপতি, সন্দ্বীপ স্টুডেন্টস ফোরাম
৮৬.**নূরুল আমিন,** সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় যুব ফেডারেশন, চট্টগ্রাম
৮৭.**রাশেদ হাসান,** সভাপতি, প্রমা আবৃত্তি সংগঠন
৮৮.**পুলক দেব দাশ,** সদস্য, প্রথম আলো বন্ধুসভা, চট্টগ্রাম
৮৯.**নূরুল আমিন মানিক,** এনজিও প্রতিনিধি, সেপ
৯০.**আইয়ুব আলী,** কার্যক্রম কর্মকর্তা, উপমা
৯১.**জাবেদ নজরুল ইসলাম,** কমিশনার, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন
৯২.**এস এম আব্দুল নুর,** মুক্তিযোদ্ধা সংগঠক
৯৩.**এ এম এম খায়রুল বারী,** ছাত্র
৯৪.**এম এ মান্নান,** সাবেক মন্ত্রী ও প্রবীণ রাজনীতিবিদ
৯৫.**আবদুল্লাহ আল নোমান,** মন্ত্রী, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

সমন্বয়কারী

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য: নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি

সূচনা পর্ব

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

জাতীয় নির্বাচন ২০০৭-কে সামনে রেখে সিপিডি এ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর সঙ্গে উদ্যোক্তা হিসেবে রয়েছে প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও চ্যানেল আই। সিপিডির পক্ষ থেকে এ ধরনের কাজ এটাই প্রথম নয়। ২০০১ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগেও একটি টাস্কফোর্স গঠন করে বিশেষজ্ঞ নাগরিকদের মতামত নিয়ে আগত সরকারের জন্য একটি সুপারিশমালা আমরা তৈরি করেছিলাম। ২০০৩ সালে আবার সে টাস্কফোর্সের সমাবেশ ঘটিয়ে সরকারকে দেওয়া আমাদের সে সুপারিশগুলো কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে তার একটা মূল্যায়ন করেছিলাম। বিগত সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে এখন আমরা ভাবছি, নতুন করে আর কী করা যায়। দেশ বা জাতির এ মুহূর্তে কী কী প্রয়োজন।

আপনারা জানেন, এ মুহূর্তে দেশে পাঁচশালা পরিকল্পনার মতো উন্নয়নের মধ্যমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নেই। এর বদলে তিন বছর মেয়াদি দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র সরকার গ্রহণ করেছে। আমরা মনে করি, দেশের উন্নতির জন্য একটি মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা থাকা এবং লক্ষ্যটাকে আলোচনার ভিত্তিতে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন। এ লক্ষ্য স্থির করার ক্ষেত্রে ১৫ বছর সময়টা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা বিবেচনা করছি। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীনে গত ১৫ বছরে দেশে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। যদিও এর সুফল সবাই সমভাবে পায়নি। এই ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পরবর্তী ১৫ বছরের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর পেছনে আরেকটি কারণও অবশ্য রয়েছে। ১৫ বছর পর আমাদের দেশের বয়স হবে ৫০ বছর। অর্থাৎ একটি প্রজন্মের পরিশ্রমের ফসল

আমরা পেয়ে যাব। এ সময়ে আমাদের সম্ভাবনা ও অর্জনের মধ্যকার তারতম্য যেন কমিয়ে আনা যায়, সে জন্য একটি রূপকল্প তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি আমরা। এ লক্ষ্যে একটি নাগরিক কমিটিও গঠন করা হয়েছে। এই রূপকল্প বা নাগরিক আকাঙ্ক্ষাগুলোকে যদি সামনে নিয়ে আসা যায়, তাহলে রাজনীতিবিদরাও অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমাদের ধারণা। আপনাদের হাতে নাগরিক আকাঙ্ক্ষার প্রাথমিক দাবিগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে একটি বক্তব্য থাকবে। ১৫ বছর পর আপনারা কেমন বাংলাদেশ চান তা এখানে আলোচনা করবেন। আপনাদের সে আলোচনা নাগরিক আকাঙ্ক্ষার বক্তব্য তৈরির উপাদান হিসেবে নাগরিক কমিটি বিবেচনা করবে।

দেশ নিয়ন্ত্রণকারী সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সংসদ। সংসদকে রাষ্ট্রের সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু বলা হলেও তা যে নয় সেটা আমরা অনুধাবন করি। আমরা মনে করি, সংসদে যারা যাবেন তারা হবেন নাগরিকদের সবচেয়ে সম্মানিত প্রতিনিধি। তাদের নিয়ে যেন আমরা গর্ব করতে পারি। সে মানুষগুলো যেন সঠিক হয় তা নিয়ে নাগরিক সমাজের একটি বক্তব্য থাকা উচিত। অনেকে যখন বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো কাকে মনোনয়ন দেবেন, কাকে দেবেন না তা নিয়ে আমরা বলার কে। সে ক্ষেত্রে আমি বলি, আমরা বলার সবচেয়ে বড় একজন, কেননা আমরা ভোটার। বলার অধিকার আমাদের রয়েছে। তাকেই মনোনয়ন দেওয়া উচিত যিনি আমাদের বাজেটের অর্থাৎ ৭০ হাজার কোটি টাকার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে পারবেন।

আমরা স্পষ্ট ভাষায় বলেছি, আমরা প্রার্থী দেব না। রাজনীতি রাজনীতিবিদেরাই করবেন। তবে নাগরিক হিসেবে আমাদের কিছু বলার রয়েছে। আমরা রাজনীতির সুস্থ ও সম্মানজনক ধারাটি শক্তিশালী দেখতে চাই। আমাদের এ তৎপরতায় কোনো ষড়যন্ত্র নেই, নেই কোনো বিদেশি হস্তক্ষেপের ব্যাপার। আমরা মনে করি, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরই তৈরি করে নিতে হবে এবং বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।

আলোচনা

মতিউর রহমান

আজ আমরা যে উদ্যোগের মধ্য দিয়ে এখানে সমবেত হয়েছি। এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। ২০০১ ও ২০০৩ সালেও এ রকম আয়োজন হয়েছিল। তবে তখন আলোচনাগুলো ছিল মূলত ঘরের ভেতর গোলটেবিল বৈঠক। এবার আমরা মনে করেছি, পরিসরটা একটু বাড়িয়ে আলোচনা করলে ভালো হয়। আর সে জন্য আপনাদের কথাগুলো শুনতেই আমরা এসেছি। আমরা আপনাদের কথাগুলো শুনতে চাই, তা ছাপতে চাই, টেলিভিশনের মাধ্যমে তা প্রচার করতে চাই।

দেশ এখন আরেকটি নির্বাচনের দিকে এগিয়ে চলেছে, কিন্তু আমাদের কাজ অনেক। যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তাতে আশঙ্কা হচ্ছে সব কাজ সম্পন্ন করা যাবে কি না। এ নিয়ে দেশের মানুষের পাশাপাশি বিদেশিরাও আশঙ্কা প্রকাশ করছে। বিগত তিনটি নির্বাচনে আমরা দেখেছি, যারা পরাজিত হন তারা ফলাফল মেনে নিতে চান না। এবারও যদি একই ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে কী হবে তা নিয়েও শঙ্কা। অপরদিকে নির্বাচন কমিশন যেভাবে কাজ করছে, তাতে সন্দেহ আরও দৃঢ় হচ্ছে, এ কমিশন একটি সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা আদৌ করবে কি না। মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তাই বাড়ছে। দেশের দুই প্রধান দলের কোনো আলোচনা না হওয়ায় আরও সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশিরাও আজ কথা বলছে, আমরাই তাদের সে সুযোগ করে দিয়েছি। আমাদের স্বপ্ন ছিল একটা গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও বৈষম্যহীন সমাজের। কিন্তু আমাদের শুরুটা ভালো হয়নি। এরপর নামে-বেনামে চলেছে সামরিক শাসন। দেড় দশক হলো আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে গেছি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজও আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি।

সম্প্রতি আমরা দেখেছি দেশে উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান। ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাদের সামর্থ্য। সরকার বিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে। একসময় সরকার অস্বীকার করেছিল, প্রচারমাধ্যমগুলোকে গালাগালি করেছিল। অথচ দেখা গেল, প্রচারমাধ্যমে যা বলা হয়েছিল, পরিস্থিতি ছিল তার চেয়েও ভয়াবহ। কয়েকটি সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন নামে অনেক সংগঠন এখনো ক্রিয়াশীল। শুধু দেশেই নয়, বাইরে থেকেও এরা সাহায্য পায়, ট্রেনিং পায়, অর্থ পায়। তাই যে পরিস্থিতিতে নির্বাচন হতে চলেছে, তা খুব একটা অনুকূল নয়। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আমরা আরেকটু দায়িত্বশীলতা

প্রত্যাশা করি। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনী ইশতেহারে অনেক প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে সবকিছু ভুলে কালো টাকা, পেশি শক্তি, দুর্নীতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

আমরা যারা এ উদ্যোগ নিয়েছি, আমাদের কোনো রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কিংবা উচ্চাভিলাষ নেই। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আমাদের দাবি, আপনারা মানুষের কথাগুলো শুনুন। অঙ্গীকারগুলো পালন করুন। কথাগুলো শোনানো, মতবিনিময়, তা নিয়ে আলোচনা, জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যেই আমাদের এ উদ্যোগ। আমরা চাই রাজনৈতিক দলগুলো ভালো থাকবে, ভালো কাজ করবে। মানুষ আজ রাজনৈতিক দলগুলোকে অবিশ্বাস করতে শুরু করেছে। আমরা চাই, জনগণের আস্থাটুকু আপনারা ফিরিয়ে আনবেন। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দলীয়করণে মদদদান বন্ধ করবেন। জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা আপনারা গড়ে তুলবেন।

অধ্যাপক আলমগীর সিরাজুদ্দীন

দেড় দশক ধরে দেশে গণতন্ত্রের চর্চা নিয়ে অনেক আলোচনা, সেমিনার হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে সমস্যা ও তা সমাধানের উপায়গুলোও চিহ্নিত হয়েছে। এ নিয়ে সুশীল সমাজ অনেক আবেদন-নিবেদন করলেও রাজনৈতিক দলগুলো তাতে কর্ণপাত করেনি। উল্টো বিভেদ ও সংঘাতের রাজনীতি প্রকট আকার ধারণ করেছে, দলগুলো পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। দলের মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা না থাকায় একদিকে যেমন যোগ্য নেতৃত্বের বিকাশ হচ্ছে না, অন্যদিকে সরকার পরিচালনায়ও স্বৈরতন্ত্রের সৃষ্টি হচ্ছে। জনগণের হাত থেকে সংসদের মালিকানা এখন ব্যবসায়ীদের হাতে চলে গেছে। আমি জানি, সুশীল সমাজের সামর্থ্য সীমিত। তাদের মূলধন সদিচ্ছা, সততা, স্বদেশপ্রেম। তারা পরামর্শ দিতে পারেন, জনমত গঠনে ভূমিকা এবং দাবি বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষকে প্ররোচিত করতে পারেন। আমার মত, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নব্বইয়ের মতো একটা গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে হবে। তাই আপনাদের এ উদ্যোগের বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে, জেলা-উপজেলায় ছড়িয়ে দিতে হবে। জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

তৃণমূলে যাওয়ার কথাটা বারবার আমাদের বলা হচ্ছে। তৃণমূলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা আমাদের আছে। এই যে প্রথম আলো, চ্যানেল আই, ডেইলি স্টারের মাধ্যমে অন্তত আমরা সচেতন শিক্ষিত মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছি। তবে আমরা কোনো সদস্যভিত্তিক সংগঠন নই। ফলে সবার কাছে গিয়ে বোঝানো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। এ জন্যই আপনাদের মতো মানুষদের আমরা দাওয়াত করে নিয়ে এসেছি। পাশাপাশি আমাদের দেশে অনেক সদস্যভিত্তিক সংগঠন রয়েছে, যারা আগে থেকেই এ কাজগুলো করে আসছেন। আমাদের আশা, তারা এটা করবেন।

খুরশীদ জামিল

বাংলাদেশের সবকিছুই এখন ঢাকাকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছে। তাই উদ্যোক্তাদের এর বাইরে আসার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। র‍্যাব নিয়ে কথা উঠছে। আমি বোধ করছি, র‍্যাব নামার পর জনগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে। কিন্তু জনগণের এ ভাবনার অনুরণন সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে কেন হচ্ছে না? সুশীল সমাজের অবশ্যই র‍্যাব ও ক্রসফায়ারের প্রশংসা করা উচিত। পাশাপাশি সংবাদপত্রের একচোখা নীতির কারণে জনগণ যেন বিভ্রান্ত না হয়, সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।

বেগম মুশতারী শফি

ভারত যখন বিভক্ত হয়, তখন তা হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে। এটা যে একটা ভুল ছিল, তা আমরা পরে বুঝতে পেরেছি। তখন আমরা ভুল শোধরানোর চেষ্টা করেছি। অনেক আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এ রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা স্বাধীন দেশ পেয়েছি। কিন্তু আমাদেরই ভুলের কারণেই আমাদের বিজয়গুলো বারবার হাতছাড়া হয়ে যেতে আমরা দেখেছি। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে। এ দেশের জন্য হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান-আদিবাসী সবার সমান আত্মত্যাগ রয়েছে। কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা সংবিধান থেকে

হারিয়েছি ধর্মনিরপেক্ষতা। রাষ্ট্রের পায়ে ধর্মের শৃঙ্খল জড়িয়ে তাকে বন্দী করে ফেলা হয়েছে, এ থেকে আমরা নাগরিকেরাও মুক্ত নই। তাই সবার আগে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে ফিরিয়ে আনতে হবে। নির্বাচনে ধর্মের ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে। আর সংসদের নারী আসনসংখ্যা বাড়াতে হবে এবং সেখানে সরাসরি নির্বাচন দিতে হবে।

এস এম নূরুল হক

আজ বিশ্ব যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে অর্থনীতি, শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে যাদের জ্ঞান রয়েছে তাদেরই আমাদের সংসদে পাঠানো উচিত। দেশের সুশীল সমাজ, পেশাজীবীরা আজ দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এ থেকে মুক্ত হতে হবে। এক ব্যক্তি কবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে পারবেন তা সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন সুশাসন। গার্মেন্টস খাতে ১৮ লাখ নারী শ্রমিক দিয়ে যদি আমরা বছরে সাত বিলিয়ন ডলার আয় করতে পারি, তবে সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে, সংসদে সৎ মানুষ পাঠিয়ে, তাদের চিন্তাধারার প্রয়োগ ঘটিয়ে আমরা অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারব বলে আমি মনে করি।

অ্যাডভোকেট খায়রুল ইসলাম

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য চাই সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। পাশ্চাত্যের দিকে যদি তাকান, দেখবেন শিল্প বিপ্লবের আগে তারা গরিব ছিল, সেখানে বেকারত্ব ছিল। ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন স্থানে লুটপাট করে তারা ধন-সম্পদ সঞ্চয় করেছে, কলকারখানা বানিয়েছে, উৎপাদন বাড়িয়েছে। এভাবে তারা উন্নতি করেছে। তাই মাথাপিছু আয় যদি বাড়ানো না যায়, জনগণের অভাব যদি পূরণ করা না যায়, তাহলে আমরা যতই বলি, নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না। পেটে ভাত না থাকলে মানুষ ভালো থাকতে পারবে না। সে খুন, রাহাজানি, ছিনতাই করবেই।

মনোয়ারা বেগম

সংসদে নারী আসনে সরাসরি নির্বাচনের দাবির সঙ্গে আমি একমত। সিটি করপোরেশনে আমরা যারা মহিলা কমিশনার আছি তারা নানা বৈষম্যের শিকার। এ নিয়ে সুশীল সমাজকে ভাবার আহ্বান জানাচ্ছি। নির্বাচনের আগে সাংসদরা যে অঙ্গীকার করেন, তা পালন করা উচিত।

এমদাদুল হক চৌধুরী

সংসদরা কয় মেয়াদে নির্বাচিত হতে পারবেন তা নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান বাড়ানোর তাগিদ তাদের মধ্যে থাকতে হবে। উন্নয়নের ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছে, এর নিরসন করতে হবে।

জামাল নজরুল ইসলাম

আজ যে সমস্যার ভেতর দিয়ে আমরা চলছি তা অত্যন্ত জটিল ও বিশ্বব্যাপী। তবে যে কাজগুলো করা হচ্ছে তা করা অবশ্যই প্রয়োজন। বাস্তবায়ন করা কঠিন, তবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

আমি এখানে এসেছি একজন উদ্বিগ্ন নাগরিক হিসেবে। আজ দেশে এক থেকে দেড় কোটি লোকের রাতে থাকার জায়গা নেই। ২০ লাখ টোকাই রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ৯৯ ভাগ লোকের মাসিক আয় পাঁচ হাজার টাকার নিচে। ১০ বছরে ১০ লাখ নারী-শিশু পাচার হয়েছে। এ অবস্থায় নিশ্চিন্তে বসে কি অঙ্ক কষা যায়? ২০০ বছর আমরা গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিলাম, সেই গোলামি এখনো আছে তবে ভিন্নভাবে। বাংলাদেশে প্রথম সরকারের অর্থনৈতিক পলিসিতে রাষ্ট্রীয়করণ সুচিন্তিতভাবে করা হয়নি। তাতে ভুল ত্রুটি অনেক ছিল। পরবর্তীকালে দেশের শিল্পে তা প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছিল, এটা স্বীকার্য। তাই বলে বিপরীত দিকে যাত্রা করে লাগামহীনভাবে ব্যক্তিমালিকানা ও বাজার অর্থনীতির প্রচলন করতে হবে–এটা আমি বিশ্বাস করি না। যেকোনো দেশের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র ও ব্যক্তিমালিকানার সুচিন্তিত, সুপরিকল্পিত ও সুপরিচালিত সমন্বয়ের অর্থনীতি। কী ধরনের অর্থনীতি হবে তা এ দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সর্বোপরি দেশের জনগণের ওপর নির্ভর করে। বিদেশি দাতা কিংবা অর্থনৈতিক সংস্থা এটা নিয়ন্ত্রণ করলে দেশের সার্বভৌমত্বের ক্ষতি হয়।

সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সবার সহযোগিতা ও সমন্বয়ের মনোভাব। কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক নেতারা প্রকাশ্যে পরস্পর সম্পর্কে যে অশ্রদ্ধামূলক মন্তব্য করেন, তাতে জনগণ বিভ্রান্ত হয় এবং তা সমস্যা সমাধানের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

মুজিবুর রহমান

র‍্যাবের পক্ষে-বিপক্ষে কথা উঠেছে। র‍্যাবের কারণে হয়তো আমরা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছি। আমরা তো আসলে শান্তি চাই। তাই আমার বক্তব্য শান্তিটা র‍্যাবের পথে না এসে সুন্দর একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এলেই ভালো হয়। সেটাই আমাদের নিশ্চিত করতে হবে।

রানা দাশগুপ্ত

১৯৪৭ সালে যখন ভারত ভাগ হয়, তখন পূর্ববঙ্গে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৯ দশমিক সাত ভাগ। ১৯৭১ সালে এ হার নেমে এসেছিল ২০ দশমিক ছয় ভাগে। আজ যখন আমরা বলছি, বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রবাহিত হচ্ছে, তখন এ হার আরও নেমে এসে পৌঁছেছে ১০ দশমিক ছয় ভাগে। আমার প্রশ্ন, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত কেন হারিয়ে গেল ১০ ভাগ সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী? কোনো রাজনৈতিক দল কি এর মূল্যায়ন করেছে? নাগরিক সমাজের কেউ কি এ নিয়ে বিপন্ন বোধ করেছে? এর মর্ম যদি অনুসন্ধান করা হতো তাহলে নিশ্চিতভাবেই এ সত্যটি বেরিয়ে আসত যে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বেশির ভাগ সময়েই রাষ্ট্র কর্তৃক উচ্ছেদ প্রক্রিয়া অনুসরণ এবং দলনির্বিশেষে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা ও দখলের স্বার্থে মেকি গণতন্ত্রের খেলাই এর পেছনে কাজ করেছে।

বিদ্যমান গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক চর্চায় সংখ্যার আনুপাতিক হারকে বিবেচনায় রেখে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সব পর্যায়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভূমিকাকে একেবারে গৌণ করে ফেলা হয়েছে। ভোটের রাজনীতিতেই তারা প্রাধান্য পায়। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে-পরে রাজনৈতিক বিবেচনায় সংখ্যালঘুদের ওপর নিপীড়ন-নির্যাতনের ঘটনা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শক্তি বারবার অস্বীকার করেছে।

২০০৭ সালের নির্বাচনের সময় আগের অভিজ্ঞতার মুখোমুখি আমাদের যেন হতে না হয়, সে নিশ্চয়তা আমরা চাই। আমরা এমন সংসদ চাই, যেখানে জনগণের অংশীদারত্ব, নারী-পুরুষ, সংখ্যালঘুদের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়। যাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সততা আছে, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ ব্যবহার করে না, মুক্তিযুদ্ধ ও এর চেতনা নিয়ে দ্বিচারিতার আশ্রয় নেয় না, তারাই সৎ। তাদেরই নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। আর সিপিডির এ উদ্যোগ যেন এখানেই সীমাবদ্ধ না থাকে।

আলী আশরাফ

বর্তমান নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হবে কি না তা নিয়ে এখনো সংশয় রয়েছে। নির্বাচন কমিশন যেমন সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়, তেমনি নির্বাচনী আইনেরও প্রয়োগ নেই। সংসদে পার্টটাইম এমপির সংখ্যা বেড়ে গেছে। প্রধান দুটি দলে মনোনয়ন বাণিজ্য দেখা যায়। ভোটার আইডি কার্ডের বিষয়েও দল দুটি আন্তরিক নয়। রাজনৈতিক দলগুলোর আয়-ব্যয়ের হিসাব অডিট করতে হবে। পাশাপাশি জাতীয় নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে রাষ্ট্র থেকে দলগুলোয় অর্থ দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যেকোনো চুক্তি স্বাক্ষরের আগে সে সম্পর্কিত সব তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

কমোডর এ জেড নিজাম (অব.)

বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সব সময় দুর্বল করেছে সশস্ত্র বাহিনী ও এর উচ্চাভিলাষী নেতারা। কিন্তু এ বেআইনি ও অসাংবিধানিক আচরণ নিয়ে কখনো প্রশ্ন করা হয়নি, বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হয়নি। এগুলো নিয়ে জনগণও আছে অন্ধকারে। গণতন্ত্র ফিরে এলেও রাজনীতিবিদেরা এখনো সশস্ত্র বাহিনীকে ভয় করে। এ ভয় থেকেই বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বেশি রেখে তাদের খুশি রাখা হয়। জাতীয় পরিচালনা রণকৌশলের চারটি অঙ্গ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে, রাজনৈতিক রণকৌশল, অর্থনৈতিক রণকৌশল, সামাজিক রণকৌশল ও প্রতিরক্ষা

রণকৌশল। আমাদের প্রতিরক্ষা কৌশল রক্ষণাত্মক হবে না আক্রমণাত্মক হবে, তা আমরা এখনো স্থির করতে পারিনি। ছোট দেশ হিসেবে আমাদের কৌশল রক্ষণাত্মক হওয়াটাই শ্রেয়। তাই এত এত ভারী সমরসজ্জার আমাদের প্রয়োজন নেই। জাতীয় রণকৌশল নির্ধারণ করে তার আওতায় সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রেখে পরিচালনা করতে হবে।

রেহানা কবির রানু

দেশের রাজনৈতিক নেতাদের সীমাহীন ব্যর্থতার কারণেই আজ সৎ ও যোগ্য প্রার্থী অনুসন্ধান করতে হচ্ছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় গলদ রয়েছে, তাই মেরুদণ্ডসম্পন্ন মানুষ এখানে তৈরি হচ্ছে না। দেশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, একদিকে ক্ষমতাহীন নিরন্ন মানুষ আর অন্যদিকে ক্ষমতাবান শিক্ষিত শয়তান চক্র। গণতন্ত্র যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না, তার কারণ পরিবারতন্ত্র। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। সীমাহীন ব্যর্থতা সত্ত্বেও রাজনীতিবিদদেরই এর সমাধান দিতে হবে। আর ক্রসফায়ার সম্পর্কে বলতে হয়, এক দেশে দুই আইন থাকতে পারে না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীদের সম্পৃক্ত করতে হবে। আর আজকের অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা যদি তাদের আয়ের হিসাব, ট্যাক্স সম্পর্কিত তথ্য উপস্থাপন করতেন, তাহলে তা রাজনীতিবিদদের কাছে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যেত।

জেরিনা হোসেন

উন্নয়নের লক্ষ্য সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এখন উন্নয়নের মানে হয়ে দাঁড়িয়েছে রাস্তাঘাট-ভবন নির্মাণ। আমাদের নগরগুলোর অবকাঠামো নির্মাণে ব্যক্তিস্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, জনস্বার্থ বিবেচনায় রাখা হয় না।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

আমরা এরশাদকে তাড়িয়েছিলাম, স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের মুক্তির প্রত্যাশায়। কিন্তু আমি মনে করছি, প্রকৃত গণতন্ত্র আসেনি। আগে সামরিক স্বৈরাচার ছিল, এখন গণতান্ত্রিক স্বৈরাচার। এমন একটা গণতন্ত্র এসেছে, যাতে রাজনীতিবিদদের ভূমিকা নেই, মূল্য নেই। অথচ দেশ তো তারাই পরিচালনা করবেন। তাদের শক্তি থাকতে হবে, সামর্থ্য থাকতে হবে, অবস্থান থাকতে হবে। কিন্তু এখন সংসদে ঢোকার পরপরই একজন রাজনীতিবিদ দাসে পরিণত হন। দল যে কথা বলে, দলীয় প্রধান যে সিদ্ধান্ত নেন, তা-ই তার জন্য শিরোধার্য হয়ে দাঁড়ায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার কোনো ভূমিকা থাকে না। এ কারণে কিন্তু সব রাজনৈতিক নেতাই এখন হতাশ। গণতন্ত্র হচ্ছে একটি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শাসন। অথচ গণতন্ত্রের নামে এখানে চলছে স্বৈরশাসন। সংবিধানেও রয়েছে এর সমর্থন। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে আছে, সংসদে দলীয় সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ভোট দিলে সদস্যপদ খারিজ হয়ে যায়। ফলে সেখানে সৎ প্রার্থী পাঠিয়ে লাভ কী? সিস্টেম ঢেলে সাজানো না গেলে সমাধান আসবে না।

দেশে আজ নিরপেক্ষ লোকের অভাব। কোনো দলে না ভিড়লে দুই দলই তাদের সন্দেহ করে। ছাত্র, শিক্ষক, ডাক্তার–সব পেশাজীবীই আজ বিভক্ত। সবাই দলের ওপর থেকে আসা নির্দেশে কাজ করে। ক্ষমতায় যে যায়, সে বিরোধী দলকে সংসদ থেকে তাড়ায়, রাস্তা থেকে তাড়ায়, ঘর থেকে তাড়ায়। অথচ গণতন্ত্রের সৌন্দর্যই তো বিরোধী দল। রাজনীতিতে এখনো অনেক ভালো লোক, চিন্তাশীল লোক আছেন। আমাদের ধৈর্য ধরে কাজ করে যেতে হবে।

অ্যাডভোকেট এমদাদুল ইসলাম

আমাদের দেশে নির্বাচনে যে বিজয়ী হতে পারে তাকেই ভোট দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। যে জিতবে তাকেই ভোট দেব, ভোট পচাব না–এ প্রবণতা থেকে এখনো আমরা বেরিয়ে আসতে পারিনি। মানুষকে আমরা রাজনীতিবিদেরা জাগিয়ে তুলতে পারিনি। নির্বাচন পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভারতের পশ্চিমবঙ্গও আমাদের চেয়ে এগিয়ে গেছে। সেখানে ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম চালু হয়েছে। আমাদের এখানেও সেটা চালু করা প্রয়োজন। একই

সঙ্গে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য ছবিযুক্ত ভোটার আইডি কার্ড অপরিহার্য। আর পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে যাকে ভাবা হচ্ছে তাকে পরিবর্তন করা দরকার।

কমরেড শাহ্ আলম

আমাদের দেশের মূল সংকট আসলে লুটপাটের অর্থনীতি। এর অনিবার্য ফল লুটেরা রাজনীতি, লুটেরা মূল্যবোধ। লুটপাটের অর্থনীতি যদি থাকে তাহলে লুটেরা রাজনীতি, লুটেরা মূল্যবোধ থাকবে। কেননা রাজনীতি অর্থনীতিরই ঘনীভূত বহিঃপ্রকাশ। দেশে এখন স্টেট মাফিয়া ও স্ট্রিট মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য চলছে। এ ব্যবস্থা ভাঙতে না পারলে পরিবর্তন আসবে না। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হলেই কোনো সরকার গণতান্ত্রিক হয় না। আর দেশে দারিদ্র্য থাকলে ভোট বিক্রি হবে।

চট্টগ্রামে কর্ণফুলী নদীর ওপর আমরা ঝুলন্ত সেতু চাই। কারণ পিলার সেতু হলে তা বন্দরের জন্য হুমকিস্বরূপ হবে। ছোটো ছোটো সন্ত্রাসীকে ক্রসফায়ারের নামে মারা হচ্ছে। অথচ রাঘব বোয়ালেরা কি ধরা পড়ছে? র‍্যাব কি সেখানে পৌঁছতে পারছে?

মাজহারুল হক শাহ চৌধুরী

দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদেরা আজ অবহেলিত। দলগুলোতে গণতন্ত্রের চর্চা নেই। রাজনীতিতে আজ অর্থঅস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লুটেরারা আমাদের রাজনীতি কুক্ষিগত করে রেখেছে। এ থেকে দেষকে মুক্ত করতে হবে।

স্বপন সেন

দেশের ভোটারেরা যদি নিজের ভোটটি নিজে দিতে পারে, তা যদি সঠিকভাবে গণনা হয়, মিডিয়া ক্যু যদি না হয়, তবে বলব নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোয় গণতন্ত্রের চর্চা নেই। আমার দলেও নেই। এখন দলে যদি গণতন্ত্রের চর্চা না হয়, তবে দেশে গণতন্ত্র কীভাবে আসবে?

পংকজ ভট্টাচার্য

আমাদের দেশ অনেক সম্ভাবনাময়। কিন্তু সংকট থমকে দিচ্ছে আমাদের গতি। সন্ত্রাস, দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ। জনগণের ঐকমত্য থাকলেও ওপরতলায় মতৈক্য নেই। এ জন্য রাজনৈতিক কর্মী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সুশীল সমাজ সবাইকে জনগণের এ আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে গণজাগরণ গড়ে তুলতে হবে। সংলাপ হতে হবে। বড় দুটি দলের নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছা থাকলে, আন্তরিকতা থাকলে এটা অসম্ভব নয়। নির্বাচন সঠিক সময়েই হতে হবে। ভোটার তালিকা নিয়ে বর্তমান নির্বাচন কমিশন সর্বকালের সর্বধিকৃত বলে নিজেদের প্রমাণ করেছে। তাই তাদের অধীনে নির্বাচন হতে পারে না। বয়স বাড়িয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান হিসেবে যাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তার অধীনেও নির্বাচন হতে পারে না। নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের অনাগ্রহ আমাদের মধ্যেও আছে। কালো টাকা, সন্ত্রাস, দুর্নীতিমুক্ত নির্বাচনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় উদ্যোগ নিতে হবে। মূল্যবোধের রাজনীতি আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে কালো টাকা, মাফিয়া চক্রের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। ২০০১ সালের নির্বাচনের আগে-পরে সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে, সে বিষয়ে আমাদের সোচ্চার ভূমিকা রাখতে হবে।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী

আজকের এ আলোচনায় অনেক বেশি রাজনীতিবিদের থাকা উচিত ছিল। রাজনৈতিক দলের মধ্য থেকে পরিবর্তন ঘটানোটা বেশ কঠিন। সাধারণত দেখা যায়, দল থেকে যদি অযোগ্য লোককেও মনোনয়ন দেওয়া হয়, তবে দলের স্বার্থে তাকেই সমর্থন করতে হয়। এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সংসদকে কার্যকর করা না গেলে সংকট কাটানো যাবে না। সংসদীয় কমিটির আলোচনা জনগণকে জানতে দিতে হবে। তেমনি নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনের বিষয়গুলোও

জনগণের সামতে তুলে ধরতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে। এটা স্বীকার্য, সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করা গেলে র‍্যাবের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত র‍্যাবের বিকল্প কী আছে?

ব্যবসায়ীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ সম্পর্কে এখানে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। সে প্রসঙ্গে বলছি। এটা তো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যাপার। আপনার পেশা কী সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে, আপনি সৎ কি না। যারা ফুলটাইম রাজনীতি করেন, তাদের আয়ের উৎসও জানা উচিত। অনেক রাজনীতিবিদ আছেন, যারা কিছুই করেন না। কিন্তু তাদের গুলশানে বাড়ি আছে। ব্যবসায়ী হয়ে তারপর পার্লামেন্টে যাওয়া, আর পার্লামেন্টে গিয়ে ব্যবসায়ী হওয়ার মধ্যে কোনটা শ্রেয়?

নুরজাহান খান

বর্তমান কমিশনের অধীনে নির্বাচন করা সমীচীন হবে না। দুই রাজনৈতিক দলকে অন্তত ৩০টি আসনে নারীদের মনোনয়ন দিতে হবে। জেএমবির সঙ্গে জড়িত চিহ্নিত নেতাদের নির্বাচনে প্রতিহত করতে হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধে যাদের বিশ্বাস নেই, তারা যেন ভোটে না দাঁড়ায়। জাতীয় পতাকা তাদের গাড়িতে যেন না দেখা যায়। ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ এবং সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃস্থাপন করতে হবে।

অ্যাডভোকেট মনতোষ বড়ুয়া

সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। কালো টাকার মালিকদের, যারা ট্যাক্স দিয়ে টাকা সাদা করেছে তাদেরও চিহ্নিত করতে হবে। তাদের নাম প্রকাশ করতে হবে। আর এ আলোচনা গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে দিতে হবে।

সেলিম নজরুল

দেশের দেড় কোটি প্রতিবন্ধীর নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই। তালিকা তৈরির সময় প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে অনাগ্রহ দেখা যায়। প্রতিবন্ধীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। দলীয় প্রার্থী অযোগ্য হলেও দেখা যায় দলীয় আনুগত্য থেকে সে প্রার্থীকেই ভোট দেয়া হয়। আজ দেশের জনপ্রশাসন প্রতিবন্ধী বলেই এ ধরনের আলোচনা অনুষ্ঠানের আযোজন করতে হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য

ব্যবসা করাটা আইনত বৈধ পেশা। কোনো ব্যবসায়ী যদি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন, সে ক্ষেত্রে স্বার্থের একটা বিষয় এসে দাঁড়ায়। তবে এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে নিয়ম আছে, ব্যবসায়ী যিনি আইনপ্রণেতা হিসেবে দায়িত্ব নেবেন, তিনি শপথ নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তার স্বার্থ আছে তা ঘোষণা করেন। ফলে জনগণ আইন প্রণয়ণের সময় মিলিয়ে দেখতে পারে, তার স্বার্থের পক্ষে তিনি কোনো আইন করছেন কি না। সে জন্য আমাদের দেশেও উচিত হবে সে রকম রেজিস্ট্রার অব ইন্টারেস্ট খোলা।

সাইয়েদ গোলাম হায়দার মিন্টু

রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তন করতে হবে। শুধু ভোটার আইডি নয়, সব নাগরিকের জন্য পরিচয়পত্র চাই।

মোহাম্মদ শহিদুল আলম

জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করতে হবে।

সাবিহা মুসা

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যেও নারীদের ওপর যে বর্বর পুলিশি নির্যাতন হয়, সে বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্ব কী ভাবছেন?

এম এ মান্নান

রাজনীতিবিবর্জিত কোনো রাষ্ট্র বা সমাজ হয় না। রাজনীতিবিদদের জবাবদিহিতা থাকতে হবে। এটা স্বীকার্য। রাজনৈতিক কর্মীদের অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষার ফল আমাদের এই স্বাধীন দেশ। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশে রাজনীতি রাজনীতিবিদদের হাত থেকে অন্য জায়গায় চলে গেছে। ফলে ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। দীর্ঘদিন দেশ সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। কিন্তু ভারতে এ ব্যাপারটি ঘটেনি। তাদের দেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। সেখানে নির্বাচনী কাঠামো শক্তিশালী। তাই নির্বাচন কমিশন সংস্কার করতে হবে। এ পথেই আসবে অগ্রযাত্রা।

রাজনীতিবিদদের প্রশ্ন করাটা উচিত। জবাবদিহিতা না থাকলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। আমাদের বিদ্যমান যে আইন আছে তার সঠিক প্রয়োগেই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। এর জন্য কোনো বিশেষ বাহিনীর প্রয়োজন পড়ে না। এলিট ফোর্স গঠন করার বিষয়ে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বিচারবহির্ভূত হত্যা আমি সমর্থন করতে পারি না। সমাজ যদি ব্যাধিগ্রস্ত হয়, তবে তার মূল কারণ চিহ্নিত করে তা উৎপাটন করতে হবে। সাময়িক চিকিৎসায় কাজ হবে না।

আবদুল্লাহ আল নোমান

সামাজিক শক্তি যদি রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তার অবস্থান সুদৃঢ় করতে না পারে, তাহলে উন্নয়নশীল দেশে রাজনীতিবিদদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা তারা যথাযথভাবে পালনে অনেক সময়েই সক্ষম হন না। অনেক সময় নির্লোভভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। স্বাধীনতাযুদ্ধের পর দেশকে যতটুকু এগিয়ে নেওয়া যেত তা আমরা করতে পারিনি। ফলে আমাদের প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তির ব্যবধান থেকে গেছে।

সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার থাকবে, বিরোধী দল থাকবে, সংসদ থাকবে। সরকারের যেমন জবাবদিহিতা থাকবে তেমনি বিরোধী দলেরও থাকবে। রাজনৈতিক দলগুলোরও জবাবদিহিতা থাকবে। সুশীল সমাজ যদি এ ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালন করে, তাহলে দেখা যাবে সরকারে যে-ই থাকুক সে-ই সংকটে পড়ে যাবে। কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারব না। সে জন্য আমার প্রস্তাব, সব রাজনৈতিক দলের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির মূলোৎপাটনে সামাজিক শক্তিকে শক্তিশালী করতে আরও উদ্যোগী ভূমিকা পালন করুন। পাশাপাশি সুশীল সমাজের দায়িত্বশীলতাও নিশ্চিত করতে হবে।

রাজনীতিতে কালো টাকা, দুর্বৃত্তায়নের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, এ কথা স্বীকার করি। যখন বিরোধী দলে থাকি, তখন এটা জোর দিয়ে বলি। সরকারে থাকলে ততটা জোর দিয়ে বলি না। আজ এখানে আলোচনা অনুষ্ঠানে অনেক প্রতিনিধি থাকতে পারতেন। হয়তো সবাইকে আয়োজকেরা আমন্ত্রণ জানাতে পারেনি। কিন্তু না থাকায় এ সন্দেহটা হতেই পারে, সিপিডি কি তবে কোনো রাজনৈতিক ধারাকে প্রমোট করছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, তা করছে না। তবে যেহেতু একটি ভালো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, সেহেতু তা সফল করতে বিভিন্ন চিন্তা, মতের সমাবেশ ঘটানো দরকার। এ বিষয়ে সিপিডি ভবিষ্যতে সতর্ক থাকবে বলে আশা করছি।

আমরা যখন বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য উপস্থাপন করি, তখন প্রকৃত তথ্যটাই যেন উপস্থাপন করি। নইলে জনমনে সংশয় তৈরি হয়। গত ১৫ বছরে দেশে অনেক অর্জন হয়েছে। বিদেশিদের কথাকে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের সম্পদ দিয়ে আমরা যেন এগিয়ে যেতে পারি তার ওপর জোর দিতে হবে। পাশাপাশি দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তা দূর করে আরও এগিয়ে যাওয়ার তৎপরতা অব্যাহত রাখতে হবে।

সৎ ও দুর্নীতিমুক্ত মানুষ আমাদের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজন। দেশে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিগুলোর চিত্র বেরিয়ে আসছে না। এ দুর্নীতি রোধ করা গেলে দেশের দুর্নীতি অনেকটা কমে যেত। কাজেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সামনে যারা আছে তারাই শুধু নয়, অন্তরালে যারা আছে তাদের বিরুদ্ধেও কার্যকর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যাপক সিকান্দার খান

ঢাকায় এ উদ্যোগের প্রথম সংলাপে ড. ইউনূস বলেছিলেন, দল যখন কোনো প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়, তখন দলীয় আনুগত্যের কারণে আমরা কোনো কিছু বিচার না করে তাকেই ভোট দিই। এ প্রক্রিয়াটা আর কত দিন চলতে দেওয়া যায় তা নিয়ে সেদিন প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। দলীয় আনুগত্য থেকে কাউকে দিয়ে গর্হিত কাজ করিয়ে নেওয়ার সুযোগ থেকে যাচ্ছে। তাই আমরা বলছি, না ভোট দেওয়ার সুযোগ আমাদের থাকতে হবে। সে সংলাপের পর বিভিন্ন স্থানে আলোচনাগুলো উঠে আসছে। এটাই এ উদ্যোগের প্রকৃত সাফল্য বলে আমি মনে করি। ঘরে ঘরে দুঃখ প্রকাশ না করে আমরা যদি একসঙ্গে থেকে নিজেদের মতগুলো প্রকাশ ও আদান-প্রদান করতে পারি, এ থেকে বেরিয়ে আসার উপায় অনুসন্ধান করি, তাহলে আমাদের দায় অনেকটা হালকা হয়।

এখানে এম এ মান্নান আছেন। আমরা একই স্কুলে কাছাকাছি সময়ে লেখাপড়া করেছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাকে চেনার সুযোগ হয়েছে। আবদুল্লাহ আল নোমান আমার সরাসরি ছাত্র। অনেক আগেই আমার মনে হয়েছিল, এরা দুজন একসময় দেশের মন্ত্রী হবে। তা তারা হয়েছেও। কিন্তু তাদের প্রতি যতটুকু প্রত্যাশা ছিল ততখানি তারা দিতে পারেনি। আমার প্রশ্ন, তারা মানুষ ভালো হলেও কেন প্রত্যাশা পূরণ করতে পারল না।

রাজনৈতিক দলগুলো যেহেতু দেশের একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, তাই এগুলো জাতীয় প্রতিষ্ঠান। যদিও তারা নিবন্ধন করাতে আগ্রহী নয়। এজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করেন রাজনীতিবিদেরা। তাই রাজনীতিবিদদের প্রতি আহ্বান, আপনারা এমন কোনো ব্যক্তিকে মনোনয়ন দেবেন না, যাকে আমরা ধারণ করতে পারি না। আপনারা আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ভালোভাবে দেখভাল করুন।

এতক্ষণ ধরে ধৈর্য ও নিষ্ঠাসহকারে আলোচনা শোনার জন্য সভাপতি হিসেবে আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। আর অভিনন্দন জানাই সিপিডি, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও চ্যানেল আইকে।

সংলাপ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা (সংক্ষেপিত)

রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের সংস্কার

 রাজনৈতিক নেতাদের জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার মধ্যে আনতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতন্ত্রের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা তৈরি করতে হবে। প্রধান দুই রাজনৈতিক দলকে সব জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংলাপে বসতে হবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব (অডিটিং) বাধ্যতামূলক করা উচিত। এ ক্ষেত্রে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করতে হবে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের জন্য তাদের তালিকাভুক্ত সদস্যের নাম প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা উচিত। ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানের মূল ভিত্তি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। ফ্লোর ক্রসিংয়ের ব্যবস্থা না থাকায় সাংসদেরা দলের ক্রীতদাসে পরিণত হচ্ছেন। অনাস্থা বা 'বাজেটের' মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলো বাদ দিয়ে নিজেদের ইচ্ছায় ভোট প্রদানের ব্যবস্থা রাখার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে।

বিরোধী দলের 'ছায়া সরকার'কে কার্যকর করতে হবে। সরকার পরিচালনায় স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটাতে হবে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে সৎ নেতৃত্ব পেছনে পড়ে থাকছে, তাদের সামনের সারিতে আসতে হবে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে সংস্কৃতিবোধ ও ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে, সে ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে। রাজনৈতিক পরিশুদ্ধির জন্য 'সত্যাগ্রহ' আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী সংস্কার

 নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে আরও শক্তিশালী করতে হবে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। বর্তমান নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে, তাদের পদত্যাগ করা উচিত। কোনো প্রার্থীকেই যদি যোগ্য বলে মনে না হয় তাহলে 'না' ভোটের ব্যবস্থা রাখতে হবে। যদি 'না' ব্যালট সর্বোচ্চ ভোট পায় তবে সব প্রার্থী পরিবর্তন করে রাজনৈতিক দলগুলোকে

নতুন প্রার্থী দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিতে হবে। প্রতিটি প্রার্থী-সম্পর্কিত আয়, ব্যয়, সম্পত্তি, শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ অন্যান্য বিষয়ে সব তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে। প্রতিটি ভোটারের ছবিসহ পরিচয়পত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। ভোটব্যবস্থার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে নির্বাচনে কারচুপি বন্ধ সহজ হবে। নির্বাচনী ইশতেহারকে একটি সামাজিক চুক্তি হিসেবে ঘোষণা দিতে হবে। একে বিকেন্দ্রীকরণ, অর্থাৎ এলাকা অনুযায়ী ইশতেহার রচনা করতে হবে। স্বতন্ত্র নির্বাচন কমিশন ক্যাডার প্রবর্তন করতে হবে।
একজন প্রার্থী মোট কবার নির্বাচন করতে পারবেন, তা নির্ধারণ করে দেওয়া উচিত। একজন প্রার্থী একই সঙ্গে দুটি আসনের বেশি আসনে নির্বাচন করতে পারবেন না, যদি তিনি দুটি আসনেই জয়লাভ করেন, তবে কোন আসন তিনি ছেড়ে দেবেন এবং তার স্থানে সেখানে কোন ব্যক্তি (ছায়া প্রার্থী) নির্বাচিত হবে, তা আগেই নির্ধারণ করতে হবে। ওই প্রার্থী দুটি আসনেই জয়লাভ করলে 'ছায়া প্রার্থী' স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্বাচিত হবেন। নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসনসংখ্যা বাড়াতে হবে এবং তারা সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসবেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের শতকরা ১০ ভাগ আসনে নারীদের মনোনয়ন দিতে হবে। কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে দলে টানা পাঁচ বছরের সদস্যপদ থাকতে হবে। বিজয়ী দলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন করে না, প্রতিটি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে তা বাস্তবায়নের মূল্যায়ন কীভাবে হবে তার উল্লেখ থাকতে হবে। নির্বাচনের ব্যয় নিয়ন্ত্রণে নির্বাচন কমিশনের প্রার্থীদের নির্বাচন-ব্যয় বহন করা উচিত। প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের মাধ্যমে এ ব্যয় নির্বাচন কমিশন আনুপাতিক হারে বহন করতে পারে। বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৯৭২ সালের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই সংসদের আসনসংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীদের নির্বাচনের বাইরে রাখতে হবে। যেসব ব্যক্তি শতকরা সাড়ে সাত ভাগ কর দিয়ে 'কালো' টাকা 'সাদা' করেছেন, তাদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে। তারা যদি প্রার্থী হন তবে তাদের যেন জনগণ ভোট প্রদান না করে, সে ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। ঋণখেলাপিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং তাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে প্রতিহত করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। জেএমবিসহ সব মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত চিহ্নিত ব্যক্তিদের মনোনয়ন প্রদান নিষিদ্ধ করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

 প্রতিটি নাগরিককে একটি পরিচিতি নম্বর (Identification Number) প্রদান করতে হবে, যা তিনি সব প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডসহ ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন। পুলিশ ও প্রশাসনে দলীয়করণ বন্ধ করতে হবে। এদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাধ্যতামূলকভাবে টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোকে কার্যকর করতে হবে। স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলোর সঙ্গে সুশীল সমাজের নিয়মিত বৈঠক করা যেতে পারে। নির্বাচনে প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রভাব হ্রাস করতে তাদের 'জাতীয় প্রতিরক্ষা বিধিমালা' প্রস্তুত করে তার মাধ্যমে পরিচালিত করতে হবে।

সংলাপ

 আঞ্চলিক সংলাপগুলো শুধু বিভাগীয় শহরেই নয়, জেলা, উপজেলা, গ্রাম পর্যায়েও আয়োজন করা এবং মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় প্রয়োজন। জনগণই যে সব ক্ষমতার মালিক, তা তাদের বোঝাতে হবে। সুশীল সমাজের সংলাপে নারী অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অনেক কম। এ সংখ্যা বাড়ানো উচিত।
সংলাপে সব পর্যায়ের প্রতিনিধি নেই।

সুশীল সমাজ ও সিপিডির ভূমিকা

 সুশীল সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ছে। তাদের নিরপেক্ষ থেকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সুশীল সমাজ অভিজাততন্ত্রী ও কেন্দ্রমুখী হয়ে পড়ছে। সুশীল সমাজকে 'ভেজালমুক্ত' ঘোষণা করতে হবে। সুশীল সমাজের প্রতিটি সদস্যের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে তাদের আয়, ব্যয় ও সম্পত্তির হিসাবসহ সব তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। সুশীল সমাজকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বা সম্ভাব্য প্রার্থীদের সম্বন্ধে তথ্য প্রকাশ করতে হবে। সুশীল সমাজের নাম পরিবর্তন করে 'সচেতন নাগরিক সমাজ' নামকরণ করা যেতে পারে। এতে করে তাদের

উচ্চস্থানীয় মনে হবে না। নির্বাচনের পরও সুশীল সমাজের এ উদ্যোগ চালিয়ে যেতে হবে। তা না হলে নির্বাচনের আগে এ উদ্যোগ নেওয়া অর্থবহ হয় না। সুশীল সমাজ আরও অনেক জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে তাদের ভূমিকা রাখে না, যেখানে তাদের অংশগ্রহণ প্রয়োজনীয়। Coastal Development বাস্তবায়ন Vision Paper-এ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সৎ নাগরিক গঠনের উদ্যোগ

 সুষ্ঠু ভোটের ক্ষেত্রে যোগ্য ভোটারও প্রয়োজন, ভোটারেরা যেন তাদের ভোট অর্থ বা অন্য কিছুর বিনিময়ে বিক্রি না করে, সে জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে অর্থ বা অন্য কোনো প্রলোভন সত্ত্বেও যেন তারা যোগ্য ও সৎ প্রার্থীকে ভোট প্রদান করে, তা তাদের বলতে হবে। শিক্ষার প্রসার মানুষকে দায়িত্বশীল ও সচেতন করতে পারে। তাই যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে হলে দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন। যুবকদের গণতন্ত্র বিষয়ে শিক্ষিত করতে হবে।

সংবাদপত্র ও মিডিয়া

 সংবাদপত্রের ভূমিকা আরও স্বচ্ছ করতে হবে। সরকারি বা বিরোধী দলের প্রতি যেকোনো সংবাদপত্রের ব্যক্তিগত আক্রমণের মানসকিতা পরিহার করতে হবে। নির্বাচন যেন মিডিয়ার কাছে উৎসবে পরিণত না হয়। নির্বাচনে মিডিয়া ক্যু বন্ধ করতে হবে।

মানবাধিকার

 প্রতিটি মানুষকে ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সংখ্যালঘুরা যেন ভোট প্রদানের আগে ও পরে নিরাপত্তা পায়, যেন তারা তাদের ভোটাধিকার চাপমুক্তভাবে প্রয়োগ করতে পারে। নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে, কোনোরূপ প্ররোচিত না করে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হতে দিতে হবে। র‍্যাবের ভূমিকা ও কার্যক্রম সন্তোষজনক ও কল্যাণকর। সুশীল সমাজের উচিত এ বিষয়কে সাধুবাদ জানানো। অন্যদিকে একে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হিসেবে সুশীল সমাজের প্রতিবাদ জানানো উচিত বলেও সুপারিশ আসে।

অর্থনীতি ও অন্যান্য

 কার্যকর গণতন্ত্রের (sound democracy) জন্য শক্তিশালী অর্থনীতির (sound economy) প্রয়োজন। তাই সবচেয়ে আগে প্রয়োজন মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি। অর্থনৈতিক সমতা বাস্তবায়ন এবং বেকারত্ব হ্রাস করতে না পারলে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন সম্ভব নয়। ছাত্রদের রাজনীতির বাইরে রেখে নির্বাচন করতে হবে। জাতীয় সব চুক্তির তথ্য উন্মুক্ত থাকতে হবে।